International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-VI, May 2016, Page No. 1-6
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’: একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন

ড.শঙ্কর কর
বাংলা বিভাগ বি. এইচ. কলেজ, হাউলী, বরপেটা, আসাম, ভারত

Abstract

Manik Bondopadhy is a famous novelist in creating novel in the Bengali literature. He created a famous regional Bengali novel named ‘Padmanadir Manjhi’ which attracted not only the readers but also the intellectuals. This novel is a landmark of the all the regional novel in Bengali literature.

In this novel Manik Bondopadhy a draws a picture of ketupus village where most of the people are fishermen. Very precisely he narrated their daily life style, and showed that they always fight against their fate. And also explained the life of fishermen and their culture i.e ritual, birth,death which is an essential part of regional novel.

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস সৃষ্টির ধারায় মানিক বন্দোপাধ্যায় অভিনব। বঙ্কিমের উপন্যাসে যে আদর্শবাদের আতিরেক এবং মানুষকে অভিজাত ইতিহাসের দুরত্বে স্থাপন করে দেখার প্রবণতা ছিল, ছিল ঘটনার প্রাধান্য, সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসকে নিয়ে এসেছিলেন বিশ্বাস্য বাস্তব নরনারীর মনস্তত্ত্ব প্রধান সূক্ষ্মতায়। রবীন্দ্র উপন্যাসে তাই দেখা যায় বৌদ্ধিকতা, অনেক পরিমাণে ঘটনা ও চরিত্র বাহুল্য বর্জন করে বিশ্লেষণ প্রধান।

শরৎচন্দ্রের লেখনীতে দেখি, তিনি বাস্তব উপাদান গ্রহণ করলে ও পুরোপুরি বাস্তবধর্মী লেখকনন। তাঁর মধ্যেও আদর্শবাদীও রোমাণ্টিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখনীর গুণে ছদ্মবেশের আড়ালে বাস্তব পটভূমিকাকে সজীব করে তুলেছেন। তাই তাঁর রচনায় দেখি একদিকে বাংলার যৌথ পরিবার জীবনে নরনারীর পারস্পরিক সর্ম্পকের আবেগময় অনুভূতি,অন্যদিকে নারীর লালন প্রবৃত্তিগত এমন এক প্রকাশ যা আন্তরিক অভিভাবকত্বে পুরুষ ও পরিবারকে কেন্দ্রচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করে।

এরপর, বিভূতিভূষণ- তারাশঙ্কর। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উপাদান ও বিষয়বস্তু মোটেই চমকপ্রদ নয়, অতি সাধারণ। তাঁর উপন্যাসের বিষয় মানুষ, প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম। দক্ষিণ বাংলার নদীমাতৃক গ্রাম জীবনের সরল, দরিদ্র পীড়িত জীবনের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তাতে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না। বিভূতিভূষণ দারিদ্রের ছবি এঁকেছেন কিন্তু তা নিয়ে তিনি বিদ্রোহের সুর তোলেননি। তাঁর সরল সততা ও গভীর প্রকৃতির প্রেমের অন্তরালে ছিল গরিব ও নিম্নবিত্তদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ।

আবার তারাশঙ্করে দেখি, তিনি সোজা মাটি ও মানুষকে নিয়ে লিখতে শুরু করেছেন। উপন্যাসের উপাদানের জন্য তিনি কখনও ব্যস্ত হননি। বীরভূমের গ্রামে তিনি যে পরিবেশে বড় হয়েছিলেন, সেই পরিবেশকেই তাঁর গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখেছেন দুটি দিক, একদিকে ‘সচ্ছল জমিদারি বিস্তীর্ণ কৃষি ক্ষেত্র, প্রাচীনকালের শিক্ষা ও অভিজাত্য সম্পন্ন পরিবার’। অন্যদিকে ‘সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত কয়লার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ সম্পন্ন

পরিবার'। এই লড়াইয়ে জমিদার শ্রেণির পরাভব ও ব্যবসায়ী শ্রেণির বিজয়, গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পরাজয় ও শিল্পকেন্দ্রিক শহরে অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা। তাঁর উপন্যাসে এই দুই শ্রেণির অনিবার্য দ্বন্দ্ব ও পরিণাম চিত্রিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যোয়ের জন্ম ১৮১০ এবং মৃত্যু ১৮৫৬ তে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছরের স্বল্পজীবি। আসল নাম প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই সমাধিক পরিচিত।

'পদ্মানদীর মাঝি' মানিকের এক অনন্য সৃষ্টি। বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ইতিহাসে এক নতুন দিশা। বস্তুত এই উপন্যাসেই বাংলা সাহিত্য সর্বপ্রথম একটি অভিনব সৃষ্টির সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ গেল। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় "অতসী মাসী' গল্প লিখে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর লেখার শক্তি আছে। এই গল্পই মানিকের উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। ১৯৩৫ সালে বের হল প্রথম দুটি উপন্যাস 'জননী' ও 'দিবারাত্রির কাব্য'। সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটানা বিশ বছর তিনি লিখে গেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দুঃখী আর সাহসী লেখক যিনি জীবনকে বাস্তব পটভূমিতে দেখেছেন। তাই একজন সমালোচক জানিয়েছেন, "... তাঁর মতো দুঃখী আর সাহসী লেখক আমাদের মধ্যে আর নেই।"[১] এই নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড় ও প্রত্যক্ষ ভাবে। পদ্মাতীরবর্তী ছেলেদের জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছেন। কিন্তু সমগ্র ধীবর সমাজ এ উপন্যাসের নায়ক নয়। নায়ক একটি ক্ষুদ্র ধীবর পরিবারের কর্তা কুবের। উপন্যাসের পটভূমির বিস্তার ঘটেছে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে বসতি স্থাপনের কাহিনিতে।

উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি নিয়ে তিনি বার বার দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেন।"বাস্তব জীবনকে তাঁর পরিবেশ সমেত তুলে ধরতে চেয়েছেন বলেই রোমান্টিকতা পরিত্যাগ করে তিনি বস্তুবাদকে, বিজ্ঞান দৃষ্টিতে মানব জীবনে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে-মার্কসবাদকে গ্রহণ করেন"[২]। অভ্যস্ত জীবন যাত্রার শৃঙ্খলের মধ্যে নয়, দুর্দমনীয় মানব প্রবাহের মধ্যে তিনি যেন জীবনের রহস্য সন্ধান করেছেন যেখানে মানুষ জীবন প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে পুরনো বিশ্বাস ও আশ্রয়কে ফেলে যায়। এর আগে তাঁর মতো দুঃসাহসী লেখক হয়ত আর দেখা যায়নি, যিনি মানব জীবনের জটিলতা ও গভীরতা অন্বেষণে সদা জাগ্রত।

সমাজ ও মানুষের রূঢ় ও নিষ্ঠুর সত্যকে সবরকমের আড়াল-আবডাল থেকে মুক্ত করে নিরাবেগ নিষ্ঠায় প্রকাশ করা মানিকের সৃষ্টিশক্তির অন্যতম মূল প্রেরণা। ঐশ্বরিক ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ দিয়ে মানব জীবনের সমস্যা ও দুঃখকে কোথাও লঘু করতে হয়নি তাঁর। জীবনের বিষপান করে যেন নীলকণ্ঠ লেখক। জীবনের ক্লেদ, নষ্টামি, শয়তানি, চালাকি, হঠকারিতা, স্বার্থপরতা, লোভ তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং জীবনের যে বিষ নিজে পান করেন তা থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁর লেখা। যেন পাঁকের মধ্য থেকে ফুটে ওঠা পদ্মের ঘ্রাণ।

মানিকের আগেও বাংলা গল্প- কথাসাহিত্য পার্শ্বচরিত্র ও পার্শ্ব ঘটনার সূত্র ধরে শ্রমজীবি মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এই প্রথম এই শ্রেণির মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচিত হল, যার কেন্দ্রীয় চরিত্রেরা সকলেই পদ্মাতীরের মাঝি সম্প্রদায় ও এর সমস্ত ঘটনাই তাদের জীবন নির্ভর। বাংলায় নদীবৃত্তিক উপন্যাসের অঞ্চল ভিত্তিক প্রথম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং এর গতিধারা বিস্তৃত হয়েছে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' ও অদ্বৈত মল্লাবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের মধ্যে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস- অনতিবিস্তারিত সংঘাত বাক, নিটোল, সংহত তার আঙ্গিক অবয়ব। অথচ অন্তহীন প্রাণের বহুমুখী বিস্তার এই স্বল্পায়তন রচনাকে দিয়েছে বহুমাত্রিক আবেদন। সে আবেদন কখনো সমাজের বৈষ্যমের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র প্রতিবাদ কখনো ভয়ালু- নিষ্ঠুর প্রকৃতি পসার জটিল হিংস্র উষ্ণশ্বাস, কখনো ঝড় ও বিনষ্টির রুদ্রভীষণ নেত্র নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তববাদী লেখক। তিনি জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, মানব জীবনের অতল রহস্যের গভীরে ঝাঁপ দিয়েছেন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত ছিলেন বলেই তাঁর হাতের চরিত্রগুলো এভাবে

পাঠকের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত স্পন্দিত হয়ে ওঠে। পিতার চাকরি জীবনে নানা স্থানে বদলি হওয়ার সুবাদে মানিকের নানা অঞ্চল দেখার সুযোগ ঘটে- দমকা, মহিষাদল, টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, মেদিনীপুর, কাঁথি, বাঁকুড়া, প্রভৃতি। কখনো মাঝিদের সঙ্গেঁ মেলা, মেশা, সঙ্গে তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা- এভাবেই তাঁর উপন্যাসের উপকরণ হয়ে ওঠে বাস্তব নির্ভর। মানিক জানিয়েছেন, উপন্যাসের ভিত্তি বাস্তবতা। ''উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক প্রসারিত -অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশ সমতে টেনে এনে কাহিনি ফাঁদতে হয়।''[৩] বিদেশি দুনিয়া থেকে উপাদান আহরণ করে মানব চরিত্র গড়ে তোলেননি। ক্ষণিক থেকে চিরায়ত পর্যন্ত সব বিষয়েই প্রত্যক্ষেই প্রত্যক্ষের আড়ালের জীবনের জটিলতার তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। তাই বাস্তবকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্যই পদ্মাতীরবর্তী মাঝিদের জীবন যাত্রাকে সাহিত্যে উপজীব্য করেন।

নিবিড় সমবেদনায়, সহমর্মিতায় একের মধ্যে আরেক মানুষকে এক মনের ভিতরে সুপ্ত আরেক মন খুঁজে বের করার সন্ধান করেছেন। যে সমস্ত মানুষের পরিচয় শোষক বা শোষিত বলে নয়, শ্রমিক বা মালিক বলে নয় বরং মানুষ বলে। তাই হোসেন মিয়ার মতো লোক যে ফিন ফিনে পাতলা পাঞ্জাবি, নূরে মেহেন্দি লাগায়, লালচে দাঁড়ির ফাঁকে ফিক করে হেসে জেলে পাড়ার অর্থাৎ পদ্মাতীরবর্তী কেতপুর সমাজের সব গরিব জেলেকে খুশ রাখে, শোষণ করে, ভেতরে ভেতরে আফিমের ব্যবসা করে হোসেন মিয়া। তার গরিব থেকে ধনী হওয়ার কাহিনি অসীম রহস্যে ঢাকা যা আমাদের চিত্তকে বিস্মিত করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়- 'একটা রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া। বাড়িতার নোয়াখালি অঞ্চলে। প্রথম যখন সে কেতপুরে আসিয়াছিল পরনে ছিল একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় এক ঝাঁক রুক্ষ চুল- ঘষা দিলে গায়ে খড়ি উঠত। জেলে পাড়া নিবাসী মুসলমান মাঝি জহরের বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল, জহরের নৌকায় বৈঠা বাহিত।'[৪]

অথচ আজ সে বিত্ত বান প্রভু। এই যে হোসেন মিঞা গরিব থেকে ধনী হয়েছে- সে পথ সোজা নয়, বাঁকা অমসৃণ পথ। শোষণ ও অন্যায়ের গোপন উপায়ে যে তার পথ প্রশস্ত সেখানে তার কাজ কারবারের বর্ণনায় দু-একটি সংকেতময় রেখায় জানিয়েছেন- "এই সব সুখের ব্যবস্থা সে যে কি উপায়ে করিয়েছে গ্রামের লোক ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য নতুন উপায়ে সে অর্থোপার্জন করে। নৌকা লইয়া সে হয়ত পদ্মার মাছ ধরিতে গেল- গেল সে সত্যি কারণ যাওয়াটি সকলেই দেখিতে পাইল, কিন্তু পদ্মার কোন খানে যে মাছ ধরিল মাছ বিক্রিই বা করিল কোন বন্দরে, কারো তাহা চোখে পড়িল না। তাহার নৌকার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিয়া একটা গল্প মাত্র শোনা গেল যে, যে বন্দরে তাহারা মাছ বিক্রয় করিয়াছে সেখানে নৌকায় যাতায়াত করিতে না কি সাত আট দিন সময় লাগে। তারপর কয়েকদিন হয়তো হোসেন গ্রামেই বসিয়ে থাকে। একেবারে কিছুই করে না। হঠাৎ একদিন সে উধাও হইয়া যায়। পনেরো দিন এক মাস আর তাহার দেখা মেলে না। আবির্ভাব তাহার ঘটে হঠাৎ এবং কিছুদিন পর দুশো, গরু ছাগল চালান লইয়া যায় কলি-কাতায়।"[৫]

এভাবে অর্থ উপার্জনের রহস্য অন্ধকারের আড়ালের ধনতন্ত্রের আসল শোষক রূপটি ইঙ্গিতময় যে এক সময়ে কেতপুরের ধীবরদের সঙ্গে জীবন ও জীবিকার কাজ শুরু করেছিল, কালক্রমে সে হয়ে উঠেছে এক বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন রহস্যময় পুরুষ যার গতি-বিধি জেলেদের কাছে বহুলাংশে অজ্ঞাত। বর্ষার মরশুমে ইলিশমাছের কল্যাণে জেলেদের জীবনে সাময়িক স্বচ্ছলতা দেখা দিলেও বছরের বাকি দিনগুলোতে তাদের জীবন বাঁধা থাকে আর্থিক অনটন ও নানা দুঃখ কষ্ট। হোসেন মিয়ার সহায়তায় এই দরিদ্র ছেলেদের জীবন যাত্রা নির্বাহ করা সহজ হয়ে ওঠে। তখন হোসেন মিয়া হয়ে ওঠে তাদের প্রভু। দরিদ্র অসহায় মানুষ ধনতন্ত্রের অর্থ খোঁজার অবসর পায় না কারণ বাঁচার তাগিদে তারা দিনরাত ব্যস্ত হয়ে থাকে। তাই হোসেন মিঞা ধীবরদের কাছে রহস্যময় মানুষ- জীবন যুদ্ধে জয়পরাজয়ের একেবারে সংযোগ স্থলে তারা বাস করে, মিত্র বলতে তাদের কেউ নেই "... তাহার গভীর ও দুর্জ্ঞেয় মতলব হাঁসিলের আয়োজন আরম্ভ করিলেও জেলে পাড়ায় এমন কেহ নাই তাহাকে কিছু বলিতে পারে। বলিতে হয়ত পারে। বলেনা শুধু এইজন্য যে বলা নিরর্থক তাতে কোনো লাভ হয় না। যা সে ঘটায় সমস্তই স্বাভাবিক ও

অবশ্যম্ভাবী।"[৬] হোসেন মিঞার মধ্যে ধনতন্ত্রের ও শোষণতন্ত্রের ভয়ঙ্কর রূপটি পরিস্ফূট। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখক এই দূরন্ত রহস্যময় শোষক হোসেনকে তাঁর অন্তরের দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষ হিসেবে সেখানে তার ভেতর সুপ্ত থাকে এক উদাসীন বাউল। এক মুসাফের বৈরাগী। তাই বলা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যত বড় কমিউনিষ্ট, তার চেয়েও বড় শিল্পী ও স্রষ্টা। এই স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেনের চরিত্রের মাত্রাকে এ সূত্রে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বাইরের দিক থেকে হোসেনমিয়া অমায়িক, জেলেদের দুঃখে, বিপদে বা প্রকৃতির বিপর্যয়ে সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সদা প্রস্তুত। আবার সে নতুন সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাকে অস্থির করে তোলে নবসৃষ্টির স্বপ্ন। সে স্বপ্ন দেখে ... দূর পৃথিবীর পারে ধন মানিক দ্বীপ সন্দীপ, নোয়াখালি পেরিয়ে ময়না দ্বীপের। এ উপন্যাসের ময়নাদ্বীপ মানবের এক বহু আকাঙ্খিত রহস্যস্যপুরী যেন পৃথিবীর মানুষের চিরকালের প্রকৃতি জয় করে নবসভ্যতা গঠনের ছায়া তার মধ্যে। উপন্যাসের ভাষায় - "সকলে অভিভূত হইয়া শোনে। হোসেনের মুখে, ময়নাদ্বীপের কথা কুবের কখনো শোনে নাই, আজ হোসেন বলিতে থাকে ও দ্বীপটির জন্য তার কত দরদ। নীলামে দ্বীপটি কিনিবার পর ওখানে জনপদ বসানোর স্বপ্ন দেখিতেছে সে ... কত অর্থ ও সময় যে ব্যয় করিয়াছে দ্বীপের পিছনে। ময়ানাদ্বীপের নেশা পাইয়া না বসিলে আজ তো সে বড়লোক .....।"[৭] শোষক হোসেন মিঞার ভেতরের সেই সুপ্ত কবি হোসেন, মানুষ হোসেনকে আবিষ্কার করেছেন কবি। যে মানুষ যুগে যুগে বন কেটে বসত গড়েছে, আদিম বন্য অরণ্য সভ্য জনপদে পরিণত করেছে সেই স্রষ্টা মানব সত্তার প্রতীক হোসেন। উপন্যাসিক এ সূত্রে তার ভেতরের সৃজন কুশলী কবিমনকে প্রকাশ্যে এনেছেন গরিব মাঝি কুবেরের ঘরে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছেন। ভোরে ওঠার পর - "এখন বৃষ্টি নাই, কিন্তু মেঘে মেঘে প্রভাতের রূপ অস্বাভাবিক থমথমে। হোসেন একবার মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাইল। ইয়া আল্লা নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী। হোসেনের মনের কোনে একটি স্বাভাবিক কবিত্ব ছিল, জীবনে ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে হয়তো সে কয়েকটি গীতিকা রচনা করিত .... ফুটা চালার নিচে চাটাইয়ের বিছানায় রাতটা কাটাইয়া আজ হোসেনের মনে গান ভাসিয়া আসিতেছে।"[৮]

তার উদাস ভরা গান যেন জীবনের সহস্র ক্লেদকে অপসারিত করে। একদিকে তাতে যেমন আছে হাজার বছরের ঘুমন্ত চেতনাহীন শোষিতের প্রতি জাগবার আহ্বান অন্যদিকে তাতে রয়েছে এক নিরবধি সুদূরের উদাস করা ভাটিয়ালি টান যা সব শূন্যতা রুদ্ধতাকে পেছনে ফেলে আলোর পথ দেখায়। এই গানটি যেন পদ্মানদীর মাঝি এক উপন্যাসের এক ধ্রুবপদ-

"আঁধার রাইতে আশমান জমিন
ফারাক কইর‍্যা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।
বায়ে বিবি ডাইনে পোলা
অকাল এসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।"[৯]

পদ্মাতীরের কেতপুর গ্রামে যে ধীরব সম্প্রদায়ের বাস, কুবের মাঝি তাদেরই একজন। পদ্মা এই উপন্যাসের এক রহস্যময় চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নদী চরিত্র কুবের চরিত্রের বিকাশে সহায়ক হইয়াছে। সে বলিষ্ঠ পুরুষ। তার সন্তানের মধ্যে লখা ও চণ্ডী এখন শিশু। তার স্ত্রী মালা পঙ্গু। তার জীবনে রয়েছে এক স্থায়ী বিষণ্ণতা। তার প্রেম ও অপ্রেম নিয়ে সেও পদ্মা প্রভাবিত এক খেয়ালী চরিত্র।

এই জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে নানা নীচতা, সংকীর্ণতা। সামাজিক দিক থেকে থেকে এরা যেমন ব্রাত্য তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা অসহায়। কুবের ও অন্যান্য জেলে যেমন- গণেশ, ধনঞ্জয়, রাসু প্রভৃতির মতো অসংস্কৃত আদিম ও অসহায় প্রাণী। অভুক্ত বিনিদ্র রাতে দেবীগঞ্জের উজানে পদ্মায় ইলিশ ধরতে ধরতে ছেঁড়া নেংটি

পরা গরিবতম গরিবতার সবল দেহে মনে নেমে আসে নুব্জ ক্লান্তি। উদয়ান্ত পরিশ্রম করে ঠকতে হয়। ধনঞ্জয় খুড়া চারশ ইলিশকে 'দুই শো সাত পঞ্চাশ খান' বলে চালায়। তাতে শোষিত বলিষ্ঠ কুবের ক্লান্ত, ক্লান্ততর হয় –"ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুঝিয়া আসিতে চায়। গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক। এমন ভাবে থাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা তাই প্রথার মতো সামাজিক ও ধর্ম – সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে।"[১০]

সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ, পুলিশ প্রশাসন প্রভৃতি কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও সাহস তার নেই। সে জানে যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকদলের ও বেশি পুঁজিপতিদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। বরং মিথ্যা, চুরি ও জেলের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে সে তার দুটি অসহায় শিশু সন্তান ও পঙ্গু স্ত্রী মালাকে ফেলে রেখে যুবতী শ্যালিকা কপিলাকে নিয়ে হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপে বসবাস করবার জন্য চলে যায়। কুবেরদের জেলে পাড়ার দুর্বিসহ জীবন দারিদ্রে হতাশায় ক্লিষ্ট। পদ্মানদীর মাঝিদের বীভৎস নোংরা অভুক্ত অর্ধভুক্ত জীবনের বর্ণনায় পরোক্ষ সমাজ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লেখকের গভীর উষ্মা ফুটে উঠেছে। "জেলে পাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনো দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা – তৃষ্ণার দেবতা, হাসি কান্নার দেবতা, আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোও দিন সাঙ্গ হয় না ..."[১১] আসে, রোগ, আসে শোক। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর। নিরুৎসব, বিষণ্ণ।

অথচ তার ভেতর প্রাণের ভরপুর ঐশ্বর্য। তার কাছ থেকে চাল কর্জ না নিয়ে গণেশ হীরু জেঠার কাছে গেছে শুনে কুবের রীতি মতো ধমক দিয়ে ওঠে – 'গরিব বইল্যা দুগা চাউল কর্জ দেওনের মতো গরিব আমি না, জাইনা থুইস।'[১২]

কুবের নামটার মধ্যে প্রাণিক স্পন্দন ও ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্য ও দুর্জয় তার প্রবল পৌরুষকে বাধা দেয়। সাদাসিধা মোটা বুদ্ধির কুবের দুর্ভাগ্যকে ভেঙে ফেলার বাসনা করলেও অতৃপ্ত আর্তনাদের মতো ঘিরে রাখে তাকে, আঘাত করে সমাজ ও পরিবেশ। যে ময়নাদ্বীপে গিয়ে রাসু সর্বহারা হয়েছে। যে ময়নাদ্বীপের নাম শুনলে ভয়ে আতঙ্কে আঁৎকে উঠতে যে, সে ময়নাদ্বীপে আজ তাকে যেতেই হয়। নিয়তি যেন তাকে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানায়। কপিলা কুবের সর্ম্পকে ফ্রয়েডীয় অবদমিত কামনার লক্ষণ স্পষ্ট। অন্যদিকে কপিলার হাত ধরে সুদূর ময়না–দ্বীপে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে চিরকালের মানুষের জীবনান্বেষণ বড় হয়ে ওঠেছে। তাই উপন্যাসের শেষ মুহুর্ত এই জীবনান্বেষণেরই প্রতীক। "ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়াছিল নৌকায়। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা, ছইয়ের মধ্যে গিয়া বসিল সে। কুবেরকে ডাকিয়া কহিল, আমারে নিবা মাঝি লগে?

হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।" [১৩]

পদ্মানদীর মাঝি মানুষের হাতে, প্রকৃতির হাতে মানুষের শোষণ বঞ্চনার নিরাবেগ কাহিনি যেমন তেমনি আবার দু-চারটি তুলির টানে এত ব্যঞ্জনা পেয়েছে এক নিরবধি সমুদ্র প্রবাহের পদধ্বনি, এক সমুদ্র সঙ্গমে ধাবমান নদীর বেহিসেবি ইতিবৃত্তি যে নিরতিকায় দুর্জেয়, নিষ্ঠুর, হিংস্র অথচ কাল-প্রবাহীনি গঙ্গে।

"কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেরা এখন একক শিকারী, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে ষ্টিমার। নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে ..... তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙিন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তরু। নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোত পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারাজীবন।"[১৪]

উল্লেখপঞ্জি :

১। মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিসিং, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ-৮১
২। তদেব, পৃ - ৮১
৩। তদেব, পৃ - ৯২
৪। বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পদ্মা নদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিলশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চত্রিংশওম সংশোধীত মুদ্রণ, (মে ২০০৫), পৃ-২০-২১
৫। তদেব, ২১
৬। তদেব, ২১
৭। তদেব - ৭৭
৮। তদেব, ৩৪-৩৫
৯। তদেব, ৩৭
১০।তদেব, ১২
১১। তদেব, ১৩
১২। তদেব, ১৯
১৩। তদেব, ১০৮
১৪।তদেব,৭৫-৭৬